ভাষার বিবিধ মাত্রা

এষা দে

ঃ জাতি, সত্তা ও প্রগতি

বিশ্ব জাতিসত্তাবোধ বিকাশের অনেকগুলি মডেল বা ছাঁচ আছে। পশ্চিম ইয়োরোপে নব জাগরণের পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়তা গড়ে উঠেছে। এখানে তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চতম শাসক শ্রেণী পর্যন্ত এক ভাষা ব্যবহারে সামাজিক অর্থনৈতিক ভেদ সত্ত্বেও একাত্মতা উপলব্ধি যার ভিত্তি মানবতাবাদ, সাক্ষরতার প্রসার, মাতৃভাষায় বড় সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কাছে সংবাদপত্র ও গল্প উপন্যাস পৌঁছে যাওয়া। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী প্রশাসন, রাজনৈতিক সংহতি, বিজ্ঞানভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম। জাতিরাষ্ট্রগুলি যখন দুটি আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করল, তখন আর ধ্রুপদী ভাষা রাজভাষা হ'ল না, হ'ল ভিন্ন ভিন্ন বিজয়ী জাতির মাতৃভাষা , ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয় পর্তূগীজ। যেখানে যেখানে তারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন অর্থাৎ বসবাসকারী উপনিবেশে (সেট্‌লার কলোনি) তাদের উত্তরাধিকারীরা পূর্ব পুষদের আদি মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভৌগোলিক ভিত্তিকে নতুন জাতিসত্তা ঘোষণা করেছেন, সেখানে ভাষার ঐক্য জাতীয় ঐক্যের ভিত হয় নি। বরং অর্থনৈতিক স্বার্থ স্বতন্ত্র সত্তালাভে উদ্বুদ্ধ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ঔপনিবেশিক সামন্ত্রতান্ত্রিক বিভাজনই নব্য জাতি সত্তাবোধের নিয়ন্ত্রক। এটি দ্বিতীয় মডেল। পূর্ব ইয়োরোপে ও রাশিয়ায় নবজাগরণ হয় নি। সেখানে তৃতীয় একটি ছাঁচ। বহুভাষী রাষ্ট্রীয় সংগঠনে সরকারি ভাষা একটি। জারের সাম্রাজ্যের রা শিয়ার বিভিন্ন ভাষা ভাষী অঙ্গরাজ্যগুলিকে শভাষা ও শ সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করা হত। এই প্রক্রিয়ার নাম ছিল শীকরণ। অর্থাৎ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাতি গঠন। ওপর থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে ভিন্ন সত্তা বিনষ্ট করে এক জাতিবোধ তলায় চারিয়ে দেওয়া। ১৯১৭ সালের শ বিপ্লব অনেকাংশে এই শীকরণের বিদ্ধে প্রতিবাদ। বিপ্লবে াত্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্ব স্ব ভাষার মর্যাদা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ভাষার চেয়ে ঢের বেশি। তবুও রাশিয়ার ভৌগোলিক বিশালত্ব, অন্যদের তুলনায় শজাতির অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অগ্রগমনের ইতিহাস শ ভাষার আধিপত্য বজায় রাখল।

আমাদের পণ্ডিতদের মতে ভারতের জাতীয়তাবাদে এই সব ছাঁচই অল্প বিস্তর কাজ করেছে। এই মতটি গ্রহণ না করার কারণ নেই। বাঙালি যেখানেই গেছে যথ াসম্ভব ভাষা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। যদিও মুদ্রনোত্তর যুগেই প্রবাসে বঙ্গভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তা বজায়ের পথ সুগম হয়েছে। যেখানেই কিছু বাঙালি শিক্ষা, বাঙলা চর্চা, বাঙালা বইয়ের পাঠাগার, কারণ প্রথমত বাঙালি স্থানীয়দের চেয়ে সমাজসংসার আচার আচরণে মানসিকতায় বেশি আধুনিক হয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় র াখতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত মাতৃভাষা চর্চাই একটি রাজনৈতিক কাজ, পরোক্ষ প্রতিবাদ। শাসকের ভাষা ও প্রভাব থেকে ইচ্ছেমতো গ্রহণ ও বর্জন করে নিজস্ব ব্যাপ্তি নির্মাণ। এই ব্যাপ্তিই বিদেশি শাসকের সঙ্গে তার পার্থক্যের সূচক। আবার ইংরেজ শাসকের কাছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি দাবির ভাষা স্বভাবতই ইংরেজি এবং দাবিগুলিও এনলাইটেনমেন্টের ফসলের সঙ্গে পরিচয়ের ফল। আজ তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা রামমোহন রায়ের ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ র াজত্বের পক্ষ নেওয়ার তাঁকে তুলোধোনা করেছেন। কিন্তু রামমোহনই গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা (Petitions against the Press regulation 1823) এবং রাজস্ব প্রণালীর দোষত্রুটি নিয়ে প্রজাদের পক্ষ থেকে প্রথম প্রতিবাদের স্বর শাসকদের কাছে পৌঁছান (Exposition of the Practical operation of the Judicial and Revenue systems of India. 1932)। অতএব ইংরেজিও হ'ল সাম্রাজ্য বিরোধিতা এবং জ াতীয়তাবাদের অস্ত্র। শুধু তাই নয় 'ইণ্ডিয়া' নামক সম্মিলিত অলীক সত্তটির ইংরেজিতেই স্থিতি। বাঙালি তামিল মারাঠি পাঞ্জাবির যোগাযোগের মাধ্যম ইংরেজি। অর্থাৎ লিংক ল্যাংগুয়েজ হিসেবে ইংরেজি বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাই যাঁরা স্বদেশী থেকে স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝুঁকছেন, তঁ াদেরও মাধ্যম ইংরেজি— সর্বভারতীয় লেনদেনের জন্য। কিন্তু ইংরেজির 'বিদেশী' কলঙ্ক আছে। অতএব কংগ্রেস এবং বামপন্থী উভয় সত্তাবলম্বীদের সহযোগিতায় সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শে হিন্দি হ'ল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ভাষা (অফিসিয়েল লাংগুয়েজ অফ ইণ্ডিয়া) যার হিন্দি অনুবাদ 'রাষ্ট্রভাষা' এবং যার আবার অত্যাশ্চর্য ইংরেজি রূপান্তর 'ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ', যদিও একই সংবিধানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ভাষাগুলিই 'জাতীয়' বা ন্যাশনাল। হিন্দির সংবিধান নির্ধারিত কর্ম ক্ষেত্রেই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মেই শুধু যদি তার ব্যবহার সীমিত থাকত তাহলে হয়তো পরিস্থিতি আজকের মতো দাঁড়াত না। কিন্তু প্রতিনিয়ত সরক ারি কাজের বাইরে তার প্রসারের বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে— অ- হিন্দি ভাষীর দ্বারা হিন্দি শিখলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগগুলিতে বেতনবৃদ্ধি, অ-হিন্দি ভাষীর দ্ব ারা হিন্দিতে সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা, বহু পুরস্কার প্রদানে নানা ভাষাভাষী লেখক হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে পুরস্কার নিতে বাধ্য, জ্ঞানপীঠ ইত্যাদি সর্বভারতীয় পুরস্কারে সম্মানিত বিভিন্ন ভাষার পুস্তক দেবনাগরি হরফে ছাপা ইত্যাদি। সবচেয়ে মারাত্মক সরকারি সমর্থনে ভারতীয় ধনতন্ত্রের হিন্দি মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন, বৈদ্যুতিক ম াধ্যমে প্রাধান্য। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু জাতীয়তাবাদ এবং বাম মতবাদ দুইই ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্তকে কমবেশি প্রভাবিত করেছে, যেহেতু দেশজ বাঙালি শিল্পায়ন, প্রতিকূল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ঝিব্যাপী মন্দা ও মহাযদ্ধ, দেশভাগের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মিলিত চাপে প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট, অতএব ভারতের ধনতন্ত্রে বাঙলার উপস্থিতি দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রায় অদৃশ্য। আজ শিশুদের মেগামুভি ভারতীয় ভাষায়ডাব করা হলে হিন্দি তামিল তেলেগুতে হয়, বাঙলায় হয় না। অথচ বঙ্গভাষীর সংখ্যা তামিল বা তেলুগুভাষীর চেয়ে বেশি (১৯৯১ -এর জনগণনা অনুসারে)। তামিল চ্যানেলগুলির সমস্ত ভারতে রমরমা, কারণ তামিল জা তিসত্তাবোধ। তাঁদের কোনও রাজনৈতিক দল অলীক সর্বভারতীয়ত্বর কাছে সমর্পণ করেন নি।

বাঙলোর রাজনীতির অস্বচ্ছ অবস্থান, দূরদৃষ্টির অভাব এবং এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির সবচেয়ে বড় প্রকাশ সর্বদা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর প্রবণতা। এই 'অন্য' হচ্ছেন প্রায়শ পূর্বজগণ। বাঙালার উনিশ শতকীনবজাগরণ অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত এবং তার জন্য দায়ী নাকি হিন্দু উচ্চবর্ণ। প্রথম কথা নবজাগরণ বা রেনেসাঁস

মানবইতিহাসে একটি বিশেষ কাল পর্ব যেটি সংগঠিত হয়েছে একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে। যখন তখন যেখানে সেখানে নবজাগরণ হয় না। তার পেছনে বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যা। ঐতিহাসিক ঘটনার যে ভূমিকা তার পুনরাবৃত্তি ঊনিশ শতকে সুদূর ভারতের পূর্বদেশে ঘটতে পারে না। বড় জোর কিছু কিছু সাদৃশ্য মেলে। শুধু ভাষার বিষয়েই দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইয়োরোপে অন্য ভাষার অনুপ্রবেশ শক্ত বলেই মাতৃভাষার বিকাশ হয়েছে। কিন্তু ভারতে যেখানে ব াষ্পচালিত ইঞ্জিন, রেলওয়ে, ডাক ও তার এবং কিছু দিনের মধ্যে বৈদ্যুতিক মাধ্যম এসে গেল সেখানে দীর্ঘ চারশ বছর ধরে মাতৃভাষার একচ্ছত্র রাজত্ব তো দূরের কথা জনসাধারণের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারিয়ে যাওয়ারও সুযোগ মিলল না। শুধু তাই নয়, নবজাগরণে লিখিত ভাষার মুদ্রিত রূপের প্রাধান্য। যারা লিপি নির্ম াণে এ পর্যন্ত ব্যর্থ বা লিপি থাকলেও ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত তারা কি জাগরিত হওয়ার পর্যায়ে ছিল? তাদের সংখ্যা কিছু কম নয়। হিন্দু সমাজ সর্বত্রই জাতিভেদ প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহে নিম্নবর্গীয়দের প্রতি নিষ্ঠুর। কিন্তু বাঙালায় কোনওদিনই উচ্চবর্ণের আধিপত্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কম ছাড়া বেশি ছিল না। তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্রের হিন্দু সমাজের স্তর বিন্যস্ত কঠোরতা বাঙলার চেয়ে ঢের বেশি এবং সেখানে আজ অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক পরিস্থিতি, ভাষার স ম্মাননা, ভূমিজ শিল্পপতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক ইতিবাচক।যে মারাঠিরা ইতিহাসে কখনো ব্যবসায়ী জাতি ছিল না, আজ তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির শিল্পপতি। তামিল কথা চিত্রেরবাজার এখন আন্তর্জাতিক জাপান পর্যন্ত প্রসারিত। বাঙলার ঊনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষার তথাকথিত নবজাগরণশুধু উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্য বর্ণের মানুষও ছিলেন। তাছাড়া শত শত বছর ধরে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে বহু ব্রাত্য প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষভাষা লাভ করেছেন। পৃথিবীতে যেখানে যেখানে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ হয়েছে কোথাও সম াজের সর্বস্তরসমান ভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে এমন প্রমাণ নেই। এমন কি নবজাগরণের মাতৃভূমি খোদ ইটালিতেও লিখিত ভাষার সংস্কৃতিতে সকলের সমান অধিকার জন্মায় নি। সেখানেও শ্রেষ্ঠত্ব মননের, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান শ্রেণীর প্রাধান্য, ভদ্রলোক ও ছোটলোকের বৈষম্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। কায়িক শ্রমের এমনই অন াদর ছিল যে ইয়োরোপীয় নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মাইকেল এঞ্জেলো ভাস্কর্য জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করায় তাঁর পরিবারের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কারণ সেটি তাঁর পিতার কলমপেষা হিসাবরক্ষক এবং জমিভিত্তিক 'ভদ্রলোক' শ্রেণী থেকে সামাজিক চ্যুতি। এমন কি লেওনার্দো দা ভিঞ্চি চিত্রকর ছিলেন অর্থাৎ রঙতুলিতে কাজ করতেন বলে প্রথম প্রথম পাথর কাটাশ্রমিক মাইকেল এঞ্জেলোকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন। অর্থাৎ শ্রেণীভেদ সর্বত্র। আধুনিকতার ভিত্তি সর্বস াধারণের মাতৃভাষার শিক্ষার সুযোগ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ভাষার ব্যবহার যার চালিকশক্তি নিহিত মানবতাবাদে যার ফলে সর্বত্র প্রসারিত ভাষা সৃজনের অগ্রগতির প্রেরণায় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে।

ইংরেজ শাসনেই প্রথম শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হ'ল । ভারতের প্রথম বাস্তববাদী উপন্যাস লাল বিহারী দে-র 'গোবিন্দ সামন্ত', দ্য বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ' (১৮৭৪, ১৮৭৮) গ্রন্থের নায়ক গোবিন্দ সাধারণ অনুন্নতবর্ণের চাষী। কিন্তু বালক অবস্থায় গ্রামের মানুষের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালায় বাঙলা ইংরেজি শিখেছে। হিন্দু আমলে কোনও নিম্নবর্গের মানুষ আম্বেদকর হতে পারতেন না। মুসলমান শাসনে বড় জোর ধর্ম বদলে হতেন আরকেটি কালা পাহাড়। তাতে নিম্নবর্গের স্বজা তিদের অবস্থানে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হত না।

বাঙলায় তারাই পিছিয়ে রইল যাদের কাছে বাঙলা শিক্ষা পৌঁছাল না। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। থ াকলেও হয়তো তার সুবিধে সবাই গ্রহণ করত না। যেমনওড়িশার যখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হল তখন ছাপা বই পড়লে জাত যায় এই বিশ্বাসে ওড়িয়ারা তার সুযে াগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন না। স্থানীয় বাঙালিরা এগিয়ে গেলেন। শিক্ষার গুত্ব, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষার ব্যবহারিক লাভ বহু মানুষের কাছে সহজে বে াধগম্য ছিল না। ঊনবিংশ শতকে বাঙলার চাষীরা সকলে ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে 'বাবু' করে তোলা স্বভাবত সমীচীন করে করেনি। চীনে সত্তরের দশকেও একই মনোভাব দেখা যায়। পুরষানুক্রমিক জীবিকায় চিরাচরিত পদ্ধতিতে জীবন ধারণে কষ্ট হলেও অভ্যাস ত্যাগে অসমর্থ এখনো বহু মানুষ। বাঙলার তাঁতীরা বস্ত্র উৎপ াদনে আধুনিকীকরণে সমর্থ, আজ তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাঙলার তাঁত বস্ত্রের বিরাট বাজার। অথচ অসমের তাঁতীরা সেই পুরাতন পদ্ধতি এবং সীমিত বাজার নিয়ে দুরবস্থায় দিন কাটান। সব দেশেই জনসংখ্যা কায়িকশ্রমজীবী। লিখিত ভাষার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু গত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীর বহু দেশে উচ্চনীচ, সাক্ষর নিরক্ষর সকলেই এক মাতৃভাষার বন্ধনে আবদ্ধ। ষোড়শ - সপ্তদশ শতকে শেক্সপিয়ারের নাটক দেখতেএকেবারে সাধারণ শ্রমজীবী থেকে শু করে অভিজাত শ্রেণী এমন কি রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থেকেছেন। অর্থাৎ শ্রেণীভেদের ঊর্ধ্বে মাতৃভাষা।

ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের প্রভাবে আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে গরিয়সী ধারণা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু মানসে। আমরা খেয়াল করি নি ভাষা এবং জা তিসত্তা একেবারে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গাঙ্গী নয়। ইটালির মানুষ এক ভাষাভাষী, তবু তাদের এক জাতি হতে বহু শত বছর লেগেছে। জার্মান ভাষীরা জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া দুটি রাষ্ট্রেই শুধু বিভক্ত নন, ছড়িয়ে আছেন মধ্য ইয়োরোপে বহু দেশে। হিটলারের সব জার্মানদের জন্য বিস্তৃত বাসভূমি দাবি (লেবেনস্রম) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ক ারণ। মাতৃভাষা ক্ষমতা অনেকটা বিজ্ঞানের মতো, শুভ অশুভ দুটি দিকই আছে। ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্মের এক প্রেক্ষাপটে ভাষার অনৈক্য জাতিসত্তার প্রধান উপকরণ হয়েছে কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে নয়। আরব দুনিয়ায় সকলের ভাষা ও ধর্ম এক কিন্তু রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশিক বিভাজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিভাজন। আরও বড় কথা মাতৃভাষা ব্যবহার করলেই আপনি আপনি প্রগতি সর্বক্ষেত্রে হয় নি। মধ্য প্রাচ্য মাতৃভাষা ব্যবহার করা সত্ত্বেও আধুনিকীকরণে পশ্চিমের বিদ্যার উপর নির্ভরশীল। আমেরিকা মহাদেশে তো 'মাতৃভাষা' বিজেতাদেরই মাধ্যম। দেশীয় হয় উৎখাত নয় এমনই অধঃপতিত যে ভাষাহীন। একমাত্র মাধ্যম বিজেতাদের ভাষা। এখানে অগ্রগতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, রাজনৈতিক চেতনা নির্ভর করে বিজেতাদের বংশধরদের ওপর।অর্থাৎ মাতৃভাষায় জাতিসত্তা বোধ, প্র াধান্য প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল। এক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী এক জাতি বা নেশান হলে এবং মাতৃভাষার নাম রাষ্ট্রভাষা দিয়ে দিলেই রাতারাতি আদিম কৌম বা মধ্যযুগীয় জনগোষ্ঠী আধুনিক স্বনির্ভর হয়ে ওঠে ন, অবসান হয় না অবিচার অক্ষমতা ও অসাম্যের যদি না ভাষার সঙ্গে সেই মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তন সম্পৃক্ত হয়।

বাঙলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের প্রশ্নে উপরোক্ত শর্তগুলি মনে রাখা দরকার। মাতৃভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রায়ই দুরকম ভাবাবেগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এক, বঙ্গভাষী মাত্রেই এক জাতি, আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আর পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বিভাজন কৃত্রিম, কারণ রাজনৈতিক। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ নজল প্রীতিতে অর্থাৎ সাহিত্য সংস্কৃতিতে আমরা অভিন্ন, অতএব জাতিসত্তা অভিন্ন। দুই, এই রাজনৈতিক বিভাজনেই আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা দুর্বল হয়ে পড়েছি, ভারতে আর আগের মতো পাত্তা পাই না আমাদের ভাষাগত সম্মান আর নেই।

প্রথম ধারণাটির সংশয়জনক ভিত্তি অনেকেরই জানা। পশ্চিম ইয়োরোপের ঢং -এ এক ভাষা এক জাতি সর্বজনীন জাতি নির্মাণের ফর্মুলা নয়, সেখানেও সর্বত্র এক ভাষা এক জাতি প্রযোজ্য হয় নি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে এক জাতি কারা? এর উত্তর একটাই, যারা নিজেদের এক মনে করে। পূর্ববঙ্গের মানুষ যে ভাষাই বলুন না কেন তাঁরা নিজেদের ভিন্ন ভেবেছেন, আমরাও ভেবেছি। অতএব আমরা ভিন্ন। রাজনৈতিক বিভাজনই আসল বিভাজন, কারণ পাসপোর্ট বা রাষ্ট্রীয় সত্তাই পরিচয়, জীবিকা অর্জনে স্বার্থরক্ষার নিয়ামক। জীবনে রাজনীতি ও অর্থনীতির ভূমিকা সংস্কৃতির চেয়ে ঢের বেশি তা পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গঠনেই প্রমাণিত।

দ্বিতীয় ধারণাটি বাঙালির পলায়নী মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতের বিশাল অ-বাঙালি জনসাধারণের মানসে বাঙলা ভাগের সঙ্গে বাঙালি পরিচয়ের কোনও সম্পর্কই নেই। সমগ্র উপমহাদেশে গত কয়েকশ বছর ধরে বাঙালি মনে বাঙালি হিন্দু, কারণ মুসলমানেরা কোথাও তাঁদের ভাষিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেন নি। স্ব

াধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তোলার পরেও উত্তরপূর্ব ভারতের বুদ্ধিজীবীদের লেখা 'বেঙ্গলি' বা 'বাঙালি' মানে বঙ্গভাষী হিন্দু এবং 'মুসলমান' বলতে বোঝায় বঙ্গভাষী মুসলমান। আমাদের উদার বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন কিন্তু তাঁদের জানা নেই বাঙালি না মুসলমান এই ভয়ঙ্কর 'হিন্দুত্ববাদী' প্রাপ্তি বাঙালি হিন্দুর একার নয়। ভারতে সর্বত্র ভাষির পরিচয় শুধু হিন্দুদের, কারণ মুসলমানদের দেশীয় ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক সুস্পষ্ট নয় বিশেষ করে উর্দুকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একাত্ম করার পর ভারতীয় মুসলমানদের পরিচিতির সমস্যা জটিলতর হয়েছে। মুসলমানদের অপরত্ববোধ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে দেখিয়েছেন ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিধাবিভক্ত অস্তিত্বের নানা দিক যার ফলে মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের বিদ্ধতাও বহু সময়ে সোচ্চার। অনেকেরই মনে হতে পারে এসবই পুরনো কাসুন্দি। তবু সত্যেরখাতিরে উল্লেখ প্রয়োজন কারণ এই অতীত বিস্মৃতির জন্যই আমাদের দেশভাগ নিয়ে আবেগ আর বিলাপ।

শুধু বাঙলায় নয়, মুসলমানদের মাতৃভাষা, আত্মপরিচয় সম্বন্ধেসংশয় বহু রাজ্যে, সম্ভবত সর্বত্র। তার ফলে সুপরিকল্পিত ভাবে অনেক ভাষার ইসলামিকরণের প্রয়াস হয়েছে। বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় প্রচুররিমানে আরবি ফারসি শব্দ ঢুকিয়ে ভাষাগুলির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও চরিত্রনাশের চেষ্টা চলেছে যার গুত্ব দেবালয় বা ধর্মস্থান ধবংসের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। এর মধ্যে ওড়িয়া ভাষার বিকৃতিকরণ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।বাঙলা ও অসমে গত দুশ বছরে মুসলম ানদের অসাধারণ হারে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে যার প্রতিফলন হয়তো ভাষার ইসলামিকরণের দুশ্চেষ্টা। কিন্তু ওড়িশায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনুপাতিক হারে ব াড়ে নি। তাঁরা নেহাৎই সংখ্যালঘু। তবু শাসনতন্ত্রে ফারসি আধিপত্যের ফলে ওড়িয়া এমন একটি জগাখিচুড়ি ভাষায় পরিণত হয়েছিল যে তার অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল। বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের নেতৃত্বে বাঙলা ভাষা উদ্ধারকে যারা নব্য হিন্দুত্ব বলে প্রচার করেন তাঁরা কি ওড়িয়া ভাষার খবর রাখেন? আধুনিক ওড়িয়া গদ্যের জনক যিনি ব্রাহ্মণ কায়স্থ নন, সেই ফকীরমোহন সেনাপতির বিখ্যাত গ্রন্থ 'ছ মান আট গুণ্ঠ' তে মুসলমান দারোগার রিপোর্টে এই পতিত ওড়িয়ার একটিতীব্র শ্রেষাত্মক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'আত্মজীবন চরিত্র'-এ ফকীরমোহন দেখিয়েছেন ওড়িয়া গদ্যসৃষ্টির প্রধানঅন্তরায় ছিল ইসলামিকরণ আরবি - ফরাসির প্র াধান্য। তাঁর সুচিন্তিত মতে অন্তঃপুরের মা লক্ষ্মীদের কৃপায় ওড়িয়াভাষা রক্ষা পেয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের একেবারে প্রান্তীয় রাজ্যে যদি দেশীয় ভাষার ওপর এমন হামলা চলে তাহলে মুসলমান শাসনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বাঙলায় ইসলামিকরণের দাপট এবং একই সঙ্গে মাতৃভাষা ও জাতি সম্বন্ধেদ্বিধা ও সংশয় বহুগুণ বেশি হওয়ারই কথা। ভারতে সর্বত্রই মুসলমানদের প্রতিপত্তিশালী অংশ বহুকাল ধরে নিজেদের বিদেশী আফগান তুর্কী ইসপাহানি চাঘতাই মিশ্রিত রক্তের উত্তরাধিকারের গর্বে ভিন্নতা বজায় রাখায় কেউইঅসমীয়া বাঙালি ওড়িয়া পাঞ্জাবি তামিল তেলেগু হিসেবে ভারতে পরিচিত হন নি।

বাঙলায় তার সঙ্গে একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য। পূর্ববাঙলায় আর্যশাসন পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও ক্ষীণ, মাটি আরও নতুন, নিম্নবর্গীয়ের সংখ্যা বিশাল এবং তারা বেশির ভ াগই ছিলেন বৌদ্ধ। এঁরাই হলেন ধর্মত্যাগী নব্য মুসলমান।ভাষাচর্চা, ভাষার পরিধি এঁদের কায়িক কেন্দ্রিক জীবনে অতি সীমিত। কাজেই বাঙলা ভাষায় পারদর্শিই কখনো ঠাঁই পায় নি। বঙ্গ ভাষার বিকাশে অগ্রণী পশ্চিমবঙ্গ, সাহিত্যেও। বিংশ শতকে তিরিশের দশকে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ বাঙালা সাহিত্যের আধুনিক কবিরা যে প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হ'ন তার মূলে ছিল অনেকখানি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে বঙ্গ সাহিত্যের পশ্চিমবঙ্গীয় অঙ্গনে 'বাঙাল' অনুপ্রবেশের বিদ্ধে প্রতিক্রিয়া। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তাঁদের তুলনামূলক অনগ্রসরতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ঊনিশ শতকের সামাজিক চিত্রণে কলকাতায় 'বাঙাল' - দের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক মনোভাবের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই পূর্বের হিন্দু জমিদাররা আত্মোন্নতিএবং স্বজাতীয়দের উন্নতিবিধানে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। নিজেদের এলাকায় বাঙলা স্কুল প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের ভরণপোষণ অবশ্য কর্তব্য ছিল। আমার পিতা প্রয়াত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এক দুর্দশ াগ্রস্ত পরিারের মেধাবী সন্তান রূপে পাশের গ্রামের জমিদার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেন। বাবার মুখে শুনেছি তিনি যখন শিক্ষার্থী হিসেবে জমিদার বাড়িতে উপস্থিত হন তখন জমিদারির বিভিন্ন ভাগ বা হিস্যায় ছেলে নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। কোথাও জায়গা নেই। কিন্তু কর্তার বাবাকে অত্যন্ত পছন্দ। অতঃপর হুকুম হল ঠাকুরের হিস্যায়থাকবে। অর্থাৎ গৃহদেবতার জন্য নির্দিষ্ট অংশের খরচে বাবার শিক্ষালাভ। মুসলমান জমিদারেরা সমধর্মাবলম্বীদের জন্য বাঙলা স্কুল স্থাপন করে আধুনিক শিক্ষাকের লালন পালন করেন নি। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতা প্রসারওকরেন নি। মুজফফর আহমদের আত্মজীবনীতে দেখি তাঁর বাল্যকালে পূর্ববঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামে মাদ্রাসা, আরবি ফার্সিরছড়াছড়ি। বিদ্ধতার মধ্যে তাঁর আধুনিক শিক্ষা। বর্তমানযুগে সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবি মুসলমান পরিবারে জাতসম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ কাজী নজল ইসলামের জন্ম শিক্ষা সাহিত্যচর্চা সবই পশ্চিমবঙ্গে । কট্টর হিন্দুরা তাঁর যত সমালোচনা করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি বিদ্ধতা দেখিয়েছে তার সমধর্মীরা তাঁকে 'কাফের' 'শয়তান' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে। ইতিহাসের পরিহাসে যে বঙ্গ তাঁর জন্মভূমি নয় যে রাষ্ট্রের ঘোষিত ধর্ম একমাত্র ইসলাম, সেখানে তিনি জ াতীয় কবি। সম্ভবত জাতিসত্তা বোধে কবর বা সমাধিরও প্রয়োজন। 'বাঙাল'দের উন্নতির কর্মকাণ্ড রীতিমত বিস্তৃতছিল।ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমায় হিন্দুরা এমন শিক্ষিত হতে লাগলেন যে মেধাভিত্তিক সমস্ত জীবিকায় শুধু বাঙলায় নয় ভারতেও অনন্য। প্রান্তীয় জেলা কুমিল্লা ও শ্রীহট্টের বাসিন্দারা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উদ্যোগে আগ্রহী। বহু ব্যাংক ইনসিওরেন্স কোম্পনি ও চা বাগিচার এঁরাই পত্তন করেছেন। পূর্ববঙ্গীয়রা বিভিন্ন জীবিকায় রাজধানীকলকাতায় এসে বসবাস করেছেন বা ভারতের অন্য প্রদেশে গেছেন। তাদের ভাষাচর্চা সংস্কৃতিবোধ মর্মোদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গীয়দের থেকে ভিন্ন হয় নি। অর্থাৎ দুই বঙ্গের হিন্দুরাই পণিতদের ভ্রুকুটি অমান্য করে প্রাচীন শিক্ষা ও অর্তনৈতিক ব্যবস্থারর প্রতি মুখ ঘুরিয়ে মেধা নির্ভর বা পুঁজি নির্ভয় নব্য বৃত্তি গ্রহণ করতে অগ্রণী হয়েছেন এবং যেখ ানেইগেছেন বাঙলা ভাষা রক্ষা করেছেন। বহু সংখ্যায় বঙ্গভাষী মুসলমান প্রতিবেশী রাজ্যে জীবিকা অর্জনে স্থায়ী। যেমন আসামে। কিন্তু তাঁরা ভাষা রক্ষায় বা ভাষা চর্চায় উদ্যোগ নেন নি কারণ তাঁদের জীবিকা প্রধানত কৃষি, কায়িকশ্রম, খুচরো ব্যবসা, যেখানে ভাষার স্থান গৌণ।

১৮৮১ সালের জনগণনায় সর্বপ্রথম মুসলমানরা বাঙলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। অর্থাৎ যে বিশাল নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী কৃষ্টি বিপ্লবের প্রাথমিক ধাম শুধু অতিক্রম করেছে, যাদের ভাষার ওপর দখল প্রধানত মৌখিক এবং সেই মৌখিক রূপের মাতৃভাষা সম্বন্ধেও দোলাচল কারণ বহিরাগত ধর্মের সঙ্গে এদেশের মাটির ঐতিহ্যকে মেলাতে অনেকে অসমর্থ তারা হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর যে ভূমিজ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী উন্নততর কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফলিয়েবাণিজ্য সফল, মৌখিক থেকে লিখিত এবং লিখিত থেকে মুদ্রিত রূপে মাতৃভাষাকে সত্তার আশ্রয় করেছে, যারা যাবতীয় প্রগতিশীল পরিবর্তনমুখী সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা হয়ে গেল সংখ্যালঘু। সস্তা ভাবাবেগ প্রসূত একটি ধারণা খুব জনপ্রিয় এবং প্রচলিত যথা, আমরা বঙ্গভাষী হিন্দুমুসলমান দুজনেই এক বাঙলা মায়ের সন্তান, কিছু উচ্চবর্ণ হিন্দুর অত্যাচারে, তাদের ইংরেজি শিখে বিবর্তিত হওয়ার ফলেই মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং আজ আমরা দুটি জাতি।

এর চেয়ে মারাত্মক আত্মঘাতী প্রবঞ্চনা আর কিছু নেই। একদা হিন্দুরা মারাঠা রাজপুত শিখদের মোঘল সাম্রাজ্যেতর বিদ্ধতাকে মুসলমান শাসনের হিন্দু প্রতিরোধ হিসেবে আদর্শায়ন করে যে মারাত্মক ভুল করেছিলেন, বহিরাগত আক্রমণকারীদের ও তাঁদের বংশধরদের 'জাতীয়' অর্থাৎ তুর্কী আফগান চাঘতাই হিসেবে চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র ধর্মীয় লেবেল এঁটে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের কৌশলে মূর্খের মতো ধরা দিয়েছিলেন, আজ আবারতাঁরা উল্টো দিকে থেকে নতুন ভুল করছেন। রাষ্ট্রই জাতি সত্তার চরম নিয়ামক, সংস্কৃতি নয়। ১৯৪৫ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডাক দিয়ে যখন অবিভক্ত বাঙলার লিগ মন্ত্রীসভা দাঙ্গায় নেমেছিলেন, লড়কে লেংগে পাকিস্তান ধনিতেকলকাতার আকাশবাতাস কেঁপেছিল তখনো রবীন্দ্রনাথ নজল জীবনানন্দের সাহিত্যকীর্তি ছিল। তাতে কিছু এসে যায় নি, কারণ র াজনীতি ও অর্থনীতির ভূমিকা সর্বকালে সর্বত্র সংস্কৃতির চেয়ে বেশি। বাঙালি হিন্দুর এই ভাবালুতার জন্য বাঙলায় দেশভাগ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। পাঞ্জাবের মতো পূর্ণ লোক বিনিময় হ'ল না। পাকিস্তানে পশ্চিমপাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের জায়গাজমি সম্পত্তি পেলেন, পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা পাকিস্ত

ানে পেলেন হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি। মুসলমানদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সার্বিক বিনিময় হ'ল না। নেহ লিয়াকত চুক্তিতে বিভক্ত রাজ্যগুলিতে দুটি ধর্মের মানুষ যে যার জায়গায় থাকার অনুমতি পেলেন। কিন্তু পাকিস্তান কার্যত সেচুক্তি মানল না। দফায় দফায় হিন্দু বিতাড়ন শু হ'ল, যা এখনো অবিরাম। সেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ২৮. ০, ১৯৫১ সালে ২২.০, ১৯৬১ তে ১৮.০ সালে , ১৯৭৪ তে ১৩.৫ সালে, ১৯৮১ সালে ১২.১ এবং এখন বোধহয় ৮.০ মিলিয়নের মতো দাঁড়িয়েছে। ভারতে এ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় পৌনে দুকোটির মতো ছিন্নমূল মানুষ। কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তাদের দুর্দশাগ্রস্ত স্বাধর্মীদের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, গড়ে উঠেছে কলোনির পর কলোনি। কিন্তু তা সত্বেও প্রচুর সংখ্যায় উদ্বাস্তু ছড়িয়ে গেছেন অন্যান্য র াজ্যে। সেখানকার মানুষ, জনজাতি এলাকা ছাড়বে কেন? তাদের রাজ্য তো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয় নি। প্রাণী মাত্রেই যে ভূমিতে সে জন্মগ্রহণ করে তার ওপর দখল রাখতে চায়। জীব মাত্রেরই প্রয়োজন একটি ভূমিস্বত্ত্ব যারওপর তার স্বাভাবিক অধিকার সাব্যস্ত। ইংরেজিতে প্রকৃতির এই নিয়মকে বলা হয় টেরিটোরিয়াল ইমপারেটিভ।স্থানাধিকারের প্রাকৃতিক অনুজ্ঞা। মানুষের ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেক পরিবারের থাকে ভিটে, কৌমের বাসস্থান। স্থায়ী বসবাসে ভাষা ও ভাষাভিত্তিক জীবনচর্যার বিকাশ। প্রচুর পরিমানে অন্যভাষাভাষী মানুষের আগমনে মূল বাসিন্দাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। বিশেষ করে বহিরাগতরা যখন সভ্যতার অন্য পর্যায়ভুক্ত । যে উপজাতির ভাষা প্রধানত মৌখিক, জীবনধারণ কৃষির আদিমতম স্তরে আবদ্ধ, সেখানে কৃষিকর্মে পটু ব্যবসাবাণিজ্যে অভ্যস্ত লিখিত ভাষার অধিকারীবাঙালির অ াগমন একটি বিরাট বিপদ। অসমে মেঘালয়ে ত্রিপুরায় কুকুর বেড়ালের মতো মারা যাচ্ছে দরিদ্র বাঙালিউদ্বাস্তু। এরই নিষ্ঠুরতম দৃষ্টান্ত অসমে বাঙ্গাল খেদা আন্দে ালন। বহুভাষী অসম রাজ্যে অসমীয়াকে একমাত্র রাজ্যভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনরত বাঙালিদের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়। ১৯ মে ১৯৬১ সালে শত শত বছরের বঙ্গভাষী কাছাড় জেলার শিলচরে ১১ জন বাঙালি মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে অসম রাইফেলসেরগুলির সামনে আত্মাহুতি দেন। তঁ াদের মধ্যে ছিলেন ১৬ বছরের কিশোরী কমলা ভট্টাচার্য ও দশজন পুষ যারা সকলেই অত্যন্ত সাধারণ, প্রায় নিম্নবর্গের মানুষ। বরাক উপত্যকায় বাঙলা ভাষা রক্ষা পেল বটে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তার অবস্থান রয়ে গেল অনিশ্চিত কারণ বঙ্গভাষী মুসলমানরা বাঙলাকে তাঁদের মাতৃভাষা রূপে সেখানে স্বীকারকরেন নি। অবিভক্ত বাঙলার অবিচ্ছেদ্য অংশ কাছাড়কে ঔপনিবেশিক শাসক জনবিরল দরিদ্র অসম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেয় অর্থনৈতিক প্রশাসনিক প্রয়োজনে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে কাছাড়ের বাঙালিরা মাতৃভাষার জন্য আজওলড়ে যাচ্ছেন এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ১৯ মে দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলা ভাষা দিবস রূপে প ালন করেন না।

যাঁরা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে লোকবিনিময় না হওয়াটা ধর্মনিরপেক্ষতা, 'বাঙালি' সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরা হিন্দুত্ববাদীরূপে নিন্দিত শ্যামাপ্রসাদের প্রসাদী হিন্দু সংখ্যাধিক্য পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে মাতলেন। পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হলে সেখানে তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকার, স্বতন্ত্র ভূমির জন্য কোনও আন্দোলন করলেন না। বরং দলিত এবং মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত, উচ্চবর্ণ হিন্দুর শে াষনে সমানভাবে অত্যাচারিত এমন ধারণা চারিয়ে দিয়ে আরও বিভাজন বাড়িয়ে তুললেন। অথচ অনগ্রসর নিম্নতম বর্গের হিন্দুদের মধ্যেও বাঙলা মাতৃভাষারূপে অবিসংবাদীভাবে ব্যবহৃত এবং স্বীকৃত। তাঁরা যত প্রান্তিকই হোন না কেন এদেশের ঐতিহ্যে স্থিত। তাঁদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে, কোন দ্বিধা নেই। ফলেএকটি জাতি উৎপাটিত। আজ বিদেশি গবেষকরাও স্বীকার করেন যে ভারত উপমহাদেশে দেশ বিভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি হিন্দু এবং তার কারণ বাঙলায় লোক বিনিময়ের অসম্পূর্ণতা।

এই ছিন্নমূল প্রধানত নিম্নবর্গীয় হতভাগ্যেরা কোথায়? পুনর্বাসন পেল ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, বিহার এমন কি সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দামানে। এঁদের ম াতৃভাষা ক্রমশ বিলুপ্ত। যে সামান্য সংখ্যক মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন তাঁরা ভিটেমাটি হারালেন, কিন্তু হারালেন না মাতৃভাষা। বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুর বিশাল অংশ সবই হারিয়েছেন। ভাষা পর্যন্ত।

ইংরেজ আমলে বাঙালি যেখানে গেছে মাতৃভাষা বজায় রাখতে পেরেছে, তার মাতৃভাষা চর্চা স্থানীয় বাসিন্দা ও ইংরেজ শাসক দুজনেরই প্রশংসা পেয়েছে। কেউ মনে করে নি অন্যায় বা অশোভন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা আছে। যেমন ঃ—

১। ২৯ নং ধারায় ভাষিক সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার

২। ৩৩ নং ধারায় তাদের পছন্দ মতো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও চালানোর অধিকার

৩। ৩৪৭ নং ধারায় ভাষার সরকারী স্বীকৃতির জন্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ দাবির অধিকার

৪। ৩৫০ নং ধারায় যে কোনও ভাষায় অভিযোগ প্রতিকার দাবি পেশের অধিকার

৫। ৩৫০ ক নং ধারায় প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুবিধা থাকার অধিকার

৬। ৩৫০ খ নং ধারায় ভাষিক সংখ্যালঘুর জন্য একজন বিশেষ বিবরণীতে অফিসার নিয়োগ। ভাষা সংখ্যালঘু কমিশনের পক্ষ থেকে বার্ষিক বিবরণীতে দত্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে আছে—

১। যে এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ১৫ বা তদূধর্ব শতাংশ ভাষিক সংখ্যালঘুর বাস সেই সব এলাকায় তাদের ভাষায় বিধিনিয়ম বিজ্ঞাপ্তি ইত্যাদি অনুবাদ ও প্রকাশনা।

২। যে যে জেলায় ভাষিক সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ৬০ শতাংশ বা তদূধর্ব সেই সব জেলায় সংখ্যালঘুদের ভাষাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা।

৭। সংখ্যা লঘুদের ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষকের ব্যবস্থা

৮। ত্রিভাষা নীতি কার্যে রূপায়ণ

৯। রাজ্য সরকারের চাকরিতে ভাষিক সংখ্যালঘুদের স্থানে আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল শুধু যে বাঙালির হিন্দু উদ্বাস্তু ওড়িশা বিহার মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে এই রক্ষ াকবচগুলি থেকে বঞ্চিত হলেন তাই নয় যে সব রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে বাঙলা ভাষা পঠন পাঠনের সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলিও সুপরিকল্পিত ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ড যেখানে বহু এলাকায় বঙ্গভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পর্যন্ত বাঙলা শিক্ষা বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে বিহার উত্তর প্রদেশের বাঙালিরা আবেদন জানিয়েছেন, সরকারি পর্যায়ে কথাবার্তা বলার জন্য । প্রবাসী বাঙালির পশ্চিমবঙ্গে ভোট নেই অতএব তাঁরা অস্তিত্বহীন। বঙ্গভাষী হিন্দুদের স্থান ভারতীয় উপমহাদেশে কোথাও প্রায় নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশে ধর্ম রক্ষা দুরূহ, ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য বেশির ভাগ মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে আধুনিক চিন্তাভাবনা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী সংস্কৃতির বা সমাজতান্ত্রিক কি কল্যাণ রাষ্ট্রে আদর্শ প্রচলিত নয়। বাংল াদেশে একদিকে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে আধুনিক হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, অন্যদিকে বিশাল জনগোষ্ঠী বাঙলা ভাষায় ইসলামি মৌলবাদে দীক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে একজন ট্যুরিষ্ট বাংলাদেশের রাজসড়কে দেওয়াল লিখন দেখে এসেছেন, একবিংশ শতক দিচ্ছে ডাক, ধর্মনিরপেক্ষতা হে াক নিপাত। ধনতন্ত্রের অপরিণত অগ্রগতির দণ প্রগতিবাদী উদার বাংলাদেশীদের সমগ্র জাতির ওপর প্রভাব সীমিত, তাই এক ধ্রুপদী ঘোষণা, 'ইসলাম ধর্ম ও বাঙল

া ভাষা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল উপাদান।'

বাংলাদেশে আধুনিকতা বিকাশের পথ রোধ করে আছে মৌলবাদ, পশ্চিমবঙ্গে যেমন রাজনীতি। যে উত্তর ও পশ্চিমভারত অতীতে বাঙলাকে শুধু লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে হিসেবে শোষন করেছে, জাতীয়তাবাদী এবং সাম্যবাদী রাজনীতি তাদের সঙ্গে সংহতি এবং মজদুর ঐক্য গড়ে তুলে বাঙালির অগ্রগমন ও বৈশিষ্ট্যকে সর্ব প্রকারে খর্ব করার ব্রতে নিবেদিত প্রাণ। ভারত থেকে বাঙলা ভাষা ও বাঙালিকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্য কংগ্রস সরকার ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করার যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদে তাব্যর্থ হয়। কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দার্জিলিং জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বহিরাগত নেপালি উপজাতি গুর্খাদের গুর্খালি নামে উপভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য দাবিকে প্রশ্রয় দিয়ে পশ্চিম-বঙ্গের ভৌগোলিক সত্তায় এক স্থায়ী আঘাতহেনে গেছেন। ফলে সেখানকার আদিবাসী লেপচারা উৎখাত। অধুনা উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী নামে তথাকথিত ভিন্ন উপভাষাভাষী স্বতন্ত্র রাজ্য চাইছেন, হিন্দিভাষী ঝাড়খণ্ডীরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এলাকা কেড়ে নিতে উৎসুক। এঁরামদতপান ক্ষুদ্র স্বার্থসর্বস্ব বাঙালি জাতি বিরোধী দলগুলি থেকে।

মোট কথা বঙ্গভাষী ভূখণ্ডকে নানা অজুহাতে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে এবং এখনো করার প্রয়াস চলেছে।অজুহাত বা কারণ কখনো ধর্ম, কখনো নরগোষ্ঠী কখনো উপভাষা। এগুলিকে অজুহাত আখ্যা দেওয়া বিধেয়। মূলকারণ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তর তুলনামূলক অগ্রগমনে ঈর্ষা। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা। এই মধ্যবিত্ত মোটেই শুধু উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র বিচরণভূমি নয়। নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা মোটেই পিছিয়ে নেই বা বলা উচিত এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিশ্রমে রাজি, রাজি মানসিকতা পরিবর্তনে। ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখন বিশাল। এবং এঁরা সকলের চক্ষুশূল। গত একশ বছর ধরে সব হিন্দু বিরোধী, বাঙলা বিরোধী, দক্ষিণ বঙ্গ বিরোধী অসন্তোষ, আন্দোলন,দাঙ্গাহাঙ্গামার মূল ভিত্তি সভ্যতার দৌড়ে অন্যের পিছিয়ে পড়ার অভিশাপ। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাংলাদেশ।'না-পাক' বা অপবিত্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা ভিন্ন রাষ্ট্র গড়েছেন অথচ তাঁদের বংশধররা লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রূপে আজ সেই অপবিত্র ভূমিতে যেনতেন প্রকারেণ ঢুকেছেন এবং থেকেও যাচ্ছেন। মুসলমানদের মধ্যে যে শ্রেণী মধ্যবিত্ত হতে চাইছিলেন কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠছিলেন না বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরাই লাভবান। ধর্ম, ভাষা, জাতিসত্তা সব কিছুর ওপরে বেঁচে থাকার তাগিদ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন যার মূল প্রোথিত মানুষের বিবর্তন ক্ষমতায়।

ভারতে যে বাঙালি বিবর্তনক্ষম তার আত্মোন্নতির ক্ষমতাকে পদদলিত করে সবরকম রাজনৈতিক ফায়দাবাজি চলে। পশ্চিমবঙ্গে কোনও দলই বাঙলা ভাষার প্রতি মন দেয় নি। বরং কার্যত 'একভাষা' অধিপত্য কায়েম করেছেন। আন্দোলন, পোস্টার, স্লোগানে হিন্দির ব্যবহার লক্ষনীয়। হিন্দি শিক্ষা ও হিন্দি চর্চার যে প্রসার গত কয়েক দশকে এ রাজ্যে চলেছে তার প্রতিদানে হিন্দি বলয়ে চালু বাঙলাভাষা শিক্ষা ও চর্চার সঙ্কোচন। অথচ হিন্দির ভজনা সত্ত্বেও এ রাজ্যে হিন্দি ব্যবহারকারী পুঁজিপতিরা নতুন লগ্নী বিশেষ করেন না। কলকাতার রাস্তায় ঘাটে দোকানে বাজারে, পণ্যদ্রব্যের বাড়ি বাড়ি প্রচারে বাঙলা ব্যবহার লুপ্ত হতে চলেছে। রাষ্ট্রভাষার পায়ে দাসখত লিখে দিয়েও সমানে কেন্দ্রের অবহেলার কাঁদুনি গাওয়া হয়। অথচ যে সব রাজ্য ভাষিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয় নি, হিন্দিকে খে দিব্যি অর্থনৈতিক বিকাশের পথে তারা অগ্রণী— তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অর্থনীতি জাতীয় সত্তার অঙ্গ। আর বাঙলা ফিরে চলেছে মধ্যযুগের দিকে যখন মাতৃভাষা ছিল শুধু সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।সমস্ত রাজ্য জুড়ে তৈরি মঞ্চ, সভাঘর, চত্বর এমন কি ভাষা উদ্যানও। সেখানে প্রায়ই চলে বাঙলা ভাষাকেন্দ্রিক কিছু না কিছু অনুষ্ঠান— কবিতা পাঠ লোকসঙ্গীতের ও রবীন্দ্র, নজল, দ্বিজেন্দ্র, অতুলপ্রসাদ গীতির আসর। নাটক লিটল ম্যাগাজিন ও কথা সাহিত্য মেলা (আমিও যার ক্ষুদ্র অংশীদার) এবং অসংখ্য আলোচনা সভা। দর্শক শ্রোতার সংখ্যা গড়ে শ' দুই আড়াই হয় কি না সন্দেহ। নাটক অভিনয়ে পূর্ণ সভাগৃহ প্রায়শ দেখা যায় না। কখনো শুধু বক্তারাই শ্রোতা। অর্থাৎ সেই মধ্যযুগীয় জনসংযোগ পরিকল্পনা— ভাষার জৈবিক মাধ্যম প্রসারণ। একবিংশ শতকে প্রত্যেকের হেঁসেলে ও শোয়ার ঘরে বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অন্য ভাষা অষ্ট প্রহর বিরাজমান। এ যেন গর গাড়ির জেট বিমানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার অক্ষম ও কণ প্রয়াস। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমানে ক্ষমতা হাতানোয় রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা, অবাধ বাণিজ্যিক শুল্ক, আয়কর ইত্যাদি কাজে বাঙলা বিলোপ, ব্যাংক জাতীয়করণ ও ফলে পশ্চিমবঙ্গের পুঁজি হরির লুট। নির্ধনীকৃত বাঙলার চিহ্ ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষা ক্রমসঙ্কোচন।

আজও ব্যক্তি বাঙালি উন্নতি করে কারণ বাঙালির মেধা ধবংস হতে পারে না। কিন্তু এদেশে নয় বিদেশে, যেখানে সে আর বাঙালি থাকবে না। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজরাও আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া কানাডায় প্রবাসে আর ইংরেজ থাকতে পারে নি। ইংলন্ডে আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালির পরবর্তী প্রজন্ম বিদেশি হয়ে যাবে। ভূগোলের প্রভাব অনতিক্রম্য, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। যদি পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নতিতে বাঙলা ভাষা সহায় না হয় তাহলে বঙ্গভাষীর সংখ্যা যত কোটি হোক বাঙালি জাতির কোনও লাভ নেই। সন্তান উৎপাদনের চেয়ে নতুন চিন্তা উৎপাদন বেশি শক্তিধর কারণ সভ্যতার পথে বাহুবল ও সংখ্যার আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। জ্ঞানই শক্তির উৎস। জ্ঞান বিজ্ঞান বাণিজ্য শিল্পায়নে বাঙালিকে যদি মাতৃভাষা সাহায্য না করতে পারে তাহলে জাতি হিসেবে তার ক্রমবিলয় সুনিশ্চিত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com